আমি মনীষাকে ভালোবাসি। মনীষা আমাকে ভালোবাসে না। মনীষা অমলকে ভালোবাসে।

ব্যাপারটা এরকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এক বিশাল সন্ধেবেলা দিকচিহ্নহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে—আমি তখন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি। যাক্, একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি। অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড় হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। অমল, তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করবো।

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী

সুন্দর দেখায়! দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারী পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানলার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুল উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটরগাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু একথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ নিতে হবে তো! সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকূট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহুদূরে ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচবো এমন আশা ছিল না তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি, এসব আমি কি ভাবছি! আমি কি গর্ব করবো নাকি এ নিয়ে? ভ্যাট। সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না! ও তো কত হেঁজিপেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ অমল নীলিমার বুক চিরে রুপালী বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বুল কিংবা সাও পাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে।

সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়লো সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আমি ছুটে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলো, গাড়ি-ঘোড়া অচল হলো, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাঁটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দু'জন সখীর সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয় নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে প্রথম দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন, আসুন, চলে আসুন! আজ বৃষ্টিতে ভিজবো!

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাঁট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হলো হাঁটু গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখী দু'জন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝরাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি, সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দু'জনে, মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়লো। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা অন্য কারুর মত নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়ালছানা—এসবের মধ্যে থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কি করে? বেড়াতে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনীষার কাছে সব কিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে বলে, আসুন! যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরবো কিন্তু!

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নিচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফর্সা পেট আমার

চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি, দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ যা ভালো লাগছে আজ! এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল! বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভালো লাগে তোমার?

—ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার কক্ষণো ঠাণ্ডা লাগে না।

—তুমি তাকাও তো আমার দিকে! তোমাকে ভালো করে দেখি।

—ভালো করে দেখবেন ; আমি পাগল না আপনি পাগল?

—তা হলে দু'জনেই।

—মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজী নই! এ কথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। নির্নিমেষে আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নিচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইটালীর শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়ানো ডানার মত ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। একথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রং ভেদ করে জেগে ওঠা রুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে আমার হাত দিতে ইচ্ছে করেনি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশায় আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক এক সময় হয় এ রকম, তখন সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের পাশে আমার লোমে ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কি করে ওকে আরও খুশী করবো—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হলো, নইলে আমি বোধ হয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম!

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বললো, দেখুন, দেখুন, কি রকম ঢেউ দিচ্ছে, ঠিক নদীর মতন।

—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরীর দু'খানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

—কেন, তুমি রিসার্চ করবে না?

—ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

—তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

চোখে চোখ রাখলো, একটু হাসলো, হাসি মিশিয়েই বললো, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন? আপনি যা অহংকারী।

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে থাকে। আমি নয়, সত্যিকারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ঐরকম অহংকার দেখতে ভালোবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে, ন'টা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নিচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধপধপে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাত গোটানো, পথের দু' পাশে না তাকিয়ে অমল হাজরা মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষজন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয় নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সার্দার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়।

একদিনে নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি

দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লী থেকে কয়েক দিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি—সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কি রকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হাল্কা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগান নি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। ঐ বিশাল বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দু'জনকে দেখছিলাম—আমরা দু'জনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দু'জনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি,—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়বো পড়বো—অথচ খসে নি, কি এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনো অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, কি মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখবো!

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজ-পোশাক, কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হুঁ।

—কোথায়?

—ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে পৌঁছলো, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হলো—সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বললো, কি ভালো আছেন?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বললো, আরেঃ আপনি? আপনি ব্যাংকক্ গিয়েছিলেন না? কবে ফিরলেন?

—কাল সন্ধেবেলা।

—পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন?

অমল সংযতভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?

—একটু লেক মার্কেটের কাছে যাবো।

—চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায় নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকি নি কেন? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেতো—অমলের সঙ্গে যেতো না—অমলের সঙ্গে ওর তখনও তেমন গাঢ় চেনা ছিল না। কিন্তু আমি ডাকি নি কেন? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনো পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমলকে সরে যেতে হবে না!

ওদের দু'জনকে বড় সুন্দর মানায়। বুকটা টনটন করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, ধ্যাৎ। চেহারাই কি সব নাকি? আমি একটু বেশী রোগা—কিন্তু রোগা মানুষরা কি ভালোবাসার যোগ্য হতে পারে না?

জি এম আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করো নি, সন্ধেগুলো কাটাও কি করে?

অফিসে জি এম-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, কি আর করবো, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

—সে কি হে? আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়ংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট্।

—স্যার, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—শোনো, দিল্লী অফিস থেকে মিঃ চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা আজ গ্রাণ্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকবে। মিঃ চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়ে ওকে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

—নাইট লাইফ মানে?

—সে আমি কি বলবো? তোমরা ইয়ংম্যান যা ভালো বুঝবে! চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে!

—স্যার আমি পারবো না। অন্য কারুকে এ ভার দিন।

—সেকি? পারবে না কি? চোপরার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফ্‌ট পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

—না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবী তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

—পারবে না? ঠিক আছে, দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজী উচ্চারণটা ভালো নয়—

সন্ধের পর স্বয়ং জি এম গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে—সে আসতে পারবে না। নাও নাও, তাড়াতাড়ি, আটটায় ডিনার।

—কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভালো লাগে না! ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাবো না কিন্তু!

—বাজে বোকো না! তোমারই ভালোর জন্য বলছি—চোপরাকে খুশী করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেবো—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু...

—আমাকে ছেড়ে দিন! আমি পারবো না।

—শুধু শুধু দেরি করছো! চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই। চাকরি করতে গেলে বড় কর্তাদের খুশী করতেই হয়—তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের...

জি এম-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পাল্টে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হলো। জি এম আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ওঁর সঙ্গে নিচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে ওঠার বদলে আরও নিচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাটকা তৈরি ঘিয়ের মতন মনীষার গায়ের রং, ঠোঁট দুটি একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজীতে বলে 'লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেড়াতে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে! ঐ যে বললুম, মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীতে সে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এ পৃথিবীর কোনো কিছুই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারোদিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি, কিংবা দেখা হয় নি, কিংবা

মনীষা আমাকে খুঁজে পায় নি। তারপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভালো লাগে।

সেদিন চোখে পড়লো ওর পা দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে-কি সুন্দর ঐ পা দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধূলি-মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না। মনে হলো, মনীষার ঐ পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাবো!

মনীষা হাসলো, অবাক হলো এবং অভিমানের সুরে বললো, যান্, আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না!

—কেন? আমি কি দোষ করেছি?

—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না।

—মনি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার, মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মনি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার সঙ্গে চলো—

—এখন! ক'টা বাজে? ওমা, সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে।

—একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তা হলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারলো না, একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না—তুমি আমার সঙ্গে চলো! দেখাই যাক্ না এ কথা বলার পর কি ফল হয়! কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না। আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য। কিন্তু অমল, তুমি মনে করো না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছো। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমল বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছে—আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে—সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়া, ওরা দু'জন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইস্তাম্বুলের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে—ইস্, ওদের দুজনকে কি সুন্দর মানায়—শিল্প এরই নাম।

আমার হাত টন্‌টন্ করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরুবে, আমি আর পারছি না...না!...। আমার ছোট ভাই টাপু ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে, ন্যাড়া ছাদে, পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিস ধরে ফেলে ঝুলছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না, চোদ্দ বছরের টাপু এত ভারী, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না, আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে—টাপু একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে আর পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে, আমিও একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি—এবার দু'জনেই পড়বো—তিন তলা থেকে শান বাঁধানো ফুটপাথে—প্রাণ ভয়ে একবার আমার ইচ্ছে হলো টাপুকে ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, টাপুকে—এখান থেকে পড়লে টাপুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—টাপু আমাকে টানছে, জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাতে গেলে দু'জনেই অনেক সময় যেমন মরে—আমিও পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলুম—সেই সময় পিছন থেকে কারা যেন তিন-চারজন আমাকে ধরলো—টাপুকেও টেনে তুললো। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে মা টাপুকে বুকে চেপে ধরলেন। সেই তিন চারজন আমার পিঠ চাপড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু ওরা জানে না, আমি এক সময় টাপুকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। টাপুকে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এমন কিছু অস্বা-ভাবিক কি? জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বেশীর ভাগ মানুষই শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। টাপুকে মেরে ফেলে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলম। বেশীর ভাগ মানুষই তাই

করতো। আমি বেশীর ভাগ মানুষের দলে। এই সব স্বার্থপর বর্ণকালা, অন্ধ মানুষ কেউই প্রেমিক হতে পারে না! নাঃ, আমি মনীষার যোগ্য নই, সত্যিই। অমল মনীষাকে তুমিই নাও। আমি বিনা দ্বিধায় সরে দাঁড়াচ্ছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করবো না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোন করলাম। আগে কখনো ওকে এমন ভাবে ডাকিনি। মনি, তুমি আগামীকাল ঠিক ছ'টার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসতেই হবে। অন্য হাজার কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দাও!

মনীষা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, আসবো আসবো, ঠিক আসবো, কেন কি ব্যাপার?

—দেখা হলে বলবো, কালই দেখা হওয়া চাই, ঠিক আসবে, উইদাউট ফেইল! কথা দাও আমাকে!

মনীষার গলা কি একটু কেঁপে গেল? একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু একটুক্ষণ ভাবলো কিছু? দু'-তিন মুহূর্ত বাদে মনীষা বললো, বলছি তো যাবো? আপনি একটা পাগল!

কাল এলো। অফিস যাইনি। অফিসে গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি। আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকে যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসেবে এটা অসার্থক। আমি সরে গেলাম। সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এলো সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি। অমল মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম।

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রীক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা? তাকে দেখলে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে অমলকে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশী সিনেমা দেখি। সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট-শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেইরকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা আন্দাজ চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কি সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হলো কি করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু মদ খেয়েছে, তা খাক্ না, পাইলটের কাজ করে—ওকে কত দেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভালো ছিল। অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হলো কি করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বড়লোকের ছেলেদের বখানোই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বড় বড় হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেই সব ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলাম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠলো। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে আমি হাজির হলুম। দরজা খুললো, অবনীশের শয়তানী কাজের যোগ্য সঙ্গিনী, তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে আমি অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি সি ডি ডি আমার মেসোমশাই হন। আমি আপনার

এই বেআইনী জুয়োর আড্ডা এক্ষুণি ধরিয়ে দিতে পারি। লোক্যাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়াতে পারবেন না। কিন্তু সে-সব আমি করবো না, একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। তার ছায়াও মাড়াবেন না। সে এখানে আসতে চাইলেও তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা অমল রায়কে কোনোদিন আমি এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজী?

অবনীশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা রাজী। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয়?

—আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনো বাজার করতে যাই না। দু'একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হলো। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হলো। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমলও নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না। বাজারকরা টাইপই ও নয়। যে-লোক এক-একদিন এক এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে খুব ঠকছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, এবং বেশ মজা লাগলো। অলক্ষ্যে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কি একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। অমল একবার তরকারিওয়ালাকে বললো, এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেবো! অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি, ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না! তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক্, হয়তো অমল বেশী রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে দাঁড়ালুম, মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবেন না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকালো, চেনার ভাব দেখালো না, কিন্তু আমাকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বললো, বুঝলেন তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম, তরকারিওয়ালারও একটা আত্মসম্মান আছে, সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এসব ছোটখাটো ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য, অমলের তো এসবের অভ্যাস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইস্ তরকারিওয়ালা উল্টে যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসতো!

অন্ধ ভিখারীকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা যখন ঝুঁকে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশী আছে যে অমলের ছোটখাটো দোষ তাতে সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিন আরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারি নি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি, অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখো। তোমাকে নিচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হলো দুপুরবেলা। মিঃ চোপরা দিল্লী ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফ্ট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রাম বাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়লো। একটা মোটরগাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই

যাবো ভাবছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কি রকম সন্দেহ হলো—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ঐতো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মাথা দেখা যাচ্ছে! পাইলটের পোশাকে—অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কি সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তা হলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোক্‌কে রোক্‌কে! ঘ্যাচ্‌ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, অমল, অমল।

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কি যেন বললো। অমলের টাইয়ের গিঁট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটি যুবতী বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতীটির সাজ পোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে যে এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এয়ার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পেঁছে দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়ে নি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা খ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পড়ার মতনই উত্তেজিত। অমল চেঁচিয়ে বললো, যার ছাগল সে সামলাতে পারে নি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরাবার জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বললো, অত তেজ দেখাবেন না, মোটরগাড়ি আছে বলে ভারী ফুটানি...দে না শালাকে দু'ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেড়ায়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, আমাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটার দাম যদি দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেন না, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তক্ষুণি বার করে দিতে পারতুম। কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয় অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করবো। আমাকে না-চেনার ভান করলে কি হয়, অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাড়ার লোক হিসেবে চেনে। অমল রুক্ষ গলায় বললো, কেন দাম দেবো কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

—ইঃ উনি হর্ন দিয়েছেন। ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন!

—ক্যারদানি কত! পাশে মেয়েছেলে নিয়ে, দিন রাত্তির জ্ঞান নেই!

আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না, না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের, যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই! কত দাম; ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বললো, একশো টাকা।

অমল বললো, একশো টাকা। একটা ছাগলের দাম একশো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলেছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসতের হাটে বেচলে।

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বললো, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে! শুরু হয়েছে গালাগালি। এসব সময়ে কি সাংঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বললো, ঠিক আছে, কত টাকা দিতে হবে? কত টাকা? আমি বললুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের দু' তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর্ ধর্।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে

উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না—এক দল লোক হইহই করে ছুটে গেল সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরলো। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি দু'বার শুধু অমল, অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেও না, তুমি যেও না! এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করবো কি করে? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না! তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।